The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Special Volume-6 on **Issues Around Pedagogy: Teaching-Learning Strategies in Arts & Humanities for the 21st Century, 3rd International Conference**, 25-26 June 2025, ISSN 1813-0402

মাইকেল মধুসূদন দত্তঃ সমকালের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার
[Michael Madhusudan Dutt: The Greatest Contemporary Playwright]

Sharmin Mustari
Associate Professor, Department of Bengali, University of Chittagong, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Special Volume-6
ISSN: 1813-0402 (Print)

Received : 09 March 2025
Received in revised: 28 April 2025
Accepted: 16 March 2025
Published: 25 October 2025

Keywords:
Foundation of the play; Dramatic Motion; Social Commitment; World Literature; Learning Strategy.

ABSTRACT

Madhusudan Dutt is one of the most successful playwrights of Bengali drama. Until Madhusudan, Bengali drama was mainly religious based and confined to the rich man's house. The foundation of Bengali drama was established by Madhusudan and later it reached the public through Deenbandhu Mitra, Rabindranath Tagore and Dwijendralal Roy. Madhusudan's playwriting period was only two years. This article is based on three plays of Madhusudan- *Sermista* (1859), *Padmavati* (1860) and *Krishna Kumari* (1860).This article aims to know Madhusudan's drama as a lesson, learning the unique characteristics of each drama, realizing the relationship between drama and life, society and environment and the social commitment reflected in the drama, especially known about the comparison of world literature with native literature etc. The proposed reaserch will be conducted as a learning strategy being able to create something new by following the structure of drama, participating in coeducational activities using various forms of practice, textbook-related images, audio, video and digital media will be provide.

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার অপর নাম। বাংলা কবিতায় আধুনিকতার দ্বারোদঘাটন করেন মধুসূদন। বাংলা নাটকেও তিনি আধুনিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বাংলার নবজাগরণের মর্মসত্যকে মধুসূদন উপলব্ধির সমগ্রতা দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন। সাহিত্যশিল্পেও তিনি এই বোধকে সার্থকভাবে প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন। তাঁর নাটকের সংখ্যা ছয়। প্রথম নাটক *শর্মিষ্ঠা* (১৮৫৯)। পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে নাটকটি রচিত। *পদ্মাবতী* (১৮৬০) মধুসূদনের দ্বিতীয় নাটক।গ্রীক পুরাণ থেকে এই নাটকের কাহিনি নেওয়া হয়েছে।এরপর মধুসূদন রচনা করেন দুটি প্রহসন - *একেই কি বলে সভ্যতা?* (১৮৬০) এবং *বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ* (১৮৬০)। মধুসূদনের পঞ্চম নাট্যকর্ম *কৃষ্ণকুমারী* (১৮৬১) ।রাজপুত ইতিহাস থেকে এর কাহিনি নেওয়া হয়েছে। তাঁর সর্বশেষ নাটক *মায়াকানন* (১৮৭৩)।

সাহিত্যঅধ্যয়ন বিদ্যাশিক্ষা বলতে সাহিত্য সম্পর্কে শিক্ষাদান ও শেখার বিভিন্ন পদ্ধতি ও তত্ত্বকে বোঝায়।এতে সাহিত্য পাঠ,পাঠদান,সাহিত্যে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি অন্বেষণ, শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন কিভাবে ডিজাইন করা প্রয়োজন তা অন্তর্ভুক্ত থাকে। সাহিত্যঅধ্যয়ন বিদ্যার মূল কাজগুলো হলো-পাঠদান পদ্ধতি, শিখন কৌশল, পাঠক্রম প্রণয়ন, মূল্যায়ন ইত্যাদি। শিক্ষক সাহিত্যের বিষয়গুলো বোঝানোর ক্ষেত্রে নানারকম উপায় অবলম্বন করতে পারেন। যেমন-নিবিড় পাঠ,সাহিত্য আলোচনা-সমালোচনা কিংবা সৃজনশীল কিছু করানোর মধ্যে দিয়ে শেখানো। শিক্ষার্থীরা কিভাবে অনুধাবন, সমালোচনা, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দক্ষতা দিয়ে সাহিত্য বুঝবে,সাহিত্যে অধ্যয়ন ভালো করবে তার কৌশলগুলো থাকে শেখন কৌশলে। পাঠক্রমের নকশা প্রণয়নে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন এবং আগ্রহের বিষয় মাথায় রেখে, সাহিত্যের প্রায়োগিক গুরুত্ব বিবেচনা করে পাঠ্যপুস্তক বাছাই ও সাজানোর ওপর গুরুত্ব দেয়া হয় এবং গুরুত্বপূর্ণ, প্রতিনিধিত্বশীল, Inclusive টেক্সট বাছাইয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়। মূল্যায়নে শিক্ষার্থীদের ক্লাসটেস্ট, অ্যাসাইনমেন্ট, কুইজ, প্রেজেন্টেশন, প্রোজেক্ট তৈরি, বিতর্কের মত বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে সাহিত্য সম্পর্কে বোধগম্যতা যাচাইয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে শিক্ষাবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞের মতামত স্মরণযোগ্য-

> 'শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলের ওপর ভিত্তি করেই মূলতঃ গড়ে উঠেছে আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান। পদ্ধতি বলতে সাধারণ অর্থে কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের প্রক্রিয়াকে বোঝায়। শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল সাধারণত শ্রেণিকক্ষেই ব্যবহৃত হয়। অতীতে এ পদ্ধতি ছিল শিক্ষককেন্দ্রিক।...বর্তমান শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করে শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করেন। আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞন শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষা পদ্ধতিতে শিখন কৌশল অনুমোদন করে। আধুনিক শিক্ষার পদ্ধতি মতে শিক্ষাকে একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করা হয়। শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিখন সম্পন্ন হবে।'[১]

নাটক শেখানোর ক্ষেত্রে প্রচলিত গতানুগতিক শ্রেণি-শিক্ষণ পদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করলে নাট্যশিক্ষার তত্ত্বীয় ও প্রায়োগিক দিক অধিকতর কার্যকর হয়।মাইকেল মধুসূদনের নাটকের ক্ষেত্রে কথাটি আরো বেশি প্রযোজ্য। সাহিত্যঅধ্যয়ন বিদ্যার বৈশিষ্ট্যগুলো মধুসূদনের নাটকের পাঠদানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় শিখন ও শেখানোর কৌশল হিসেবে।

মধুসূদনের নাটক সম্পর্কে আশুতোষ ভট্টাচার্য তার *বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস* (১ম খণ্ড) এ বলেন, 'এই যুগের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নাট্যশালার নাম বেলগাছিয়া নাট্যশালা। ...সেদিনকার পাশ্চাত্য শিক্ষিত কলিকাতার সম্পন্ন বাঙ্গালী সমাজ নানাভাবে ইহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হইয়াছিলেন। মধুসূদনের নাট্যপ্রতিভাই নহে,ইহার সঙ্গে যুক্ত থাকিবার ফলেই মধুসূদন বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ পথের প্রথম সন্ধান পাইলেন সুতরাং মধুসূদনের সাহিত্যিক জীবনে বেলগাছিয়া নাট্যশালার বিশেষ একটি স্থান আছে।'[২]

বিধানদত্ত সম্পাদিত *মধুসূদন স্মৃতি* গ্রন্থে ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য 'সমসাময়িক বাংলা নাটকে মধুসূদনের প্রভাব' প্রবন্ধে বলেন,'মধুসূদন সামাজিক নাটক রচনা না করিলেও তাঁহার প্রহসনগুলি বহু সামাজিক নাটক রচনার প্রেরণা দিয়াছিল।...মধুসূদনের মধ্যেই বাংলার সমাজকে খুটিনাটি করিয়া নানাদিক হইতে দেখিবার প্রবণতা দেখা দেয়।'[৩]

শ্রুতিনাথ চক্রবর্তীর *মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী ও প্রতীচ্য ভাবনা* গ্রন্থে *কৃষ্ণকুমারী* নাটক রচনা সম্পর্কে বলেন,'...কিন্তু বৃহত্তর অর্থে এর নেপথ্যে ছিল দেশ-কালের নিজস্ব দাবি।পরাধীন ভারতবর্ষ যেন তার identity খুঁজে পেতে চাইছিল তার অতীত ঐতিহ্যের মধ্যে। অন্যদিকে তার জাতিগত সত্তার অসহায়তার যেন বিনির্মাণ ঘটছিল মধুসূদনের সৃষ্ট মেঘনাদ বা কৃষ্ণকুমারীর চরিত্রে।'[৪]

আলোচনার এই পর্যায়ে মধুসূদনের তিনটি নাটকের পরিচিতি, আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য এবং জীবন, সমাজ ও পরিপার্শ্বের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টি আলোচনার প্রয়াস রয়েছে।

শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯) মহাভারতের বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত।এটি পাঁচ অঙ্কের নাটক। রামনারায়ণ অনূদিত এবং শ্রীহর্ষ রচিত *রত্নাবলী* নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করতে গিয়ে মধুসূদন নাটক রচনার প্রেরণা অনুভব করেন। মহাভারতের শর্মিষ্ঠা-যযাতি-দেবযানী উপাখ্যান অবলম্বনে *শর্মিষ্ঠা* নাটকটি রচিত। নাটকটি উৎসর্গ করা হয় রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুরকে।বেলগাছিয়া নাট্যশালায় রামনারায়ণ তর্করত্নের *রত্নাবলী* নাটকের অভিনয় দেখে হতাশ হয়ে পরিকল্পনা করেন ইউরোপীয় রীতিতে বাংলা ভাষায় নাটক লেখার। নাটকের বিষয় হিসেবে বেছে নেন মহাভারতের আদিপর্বের শর্মিষ্ঠা-যযাতি-দেবযানী উপাখ্যান। উনিশ শতকের রেনেসাঁসের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল স্বদেশপ্রীতি, ঐতিহ্যের প্রতি গৌরববোধ ও অনুরাগ।বাংলা ভাষায় প্রথম নাটক রচনা করতে গিয়ে মধুসূদন তাই বেছে নিয়েছিলেন পৌরাণিক আখ্যান। ধর্মান্তরিত হয়েও তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন প্রাচীন ভারতীয় পুরাণের প্রতি।

মধুসূদন সংস্কৃত নাটকের প্রভাবকে নিন্দা করেছেন। সমকালীন নাট্যকারদের নাট্যচর্চাকে তিনি 'অলীক কুনাট্যরঙ্গ' বলেছেন। তাঁর নাটকে ইংরেজি নাটকের ভাব-ভাবনার স্পর্শ আছে এমন দাবীও করেছেন। 'কিন্তু শর্মিষ্ঠায় সংস্কৃত নাট্যরীতির বাঁধা পথেই তাকে চলতে হয়েছে।'[৫] সমকালীন বাংলা নাটকের প্রধান আদর্শ ছিল সংস্কৃত নাটক। মধুসূদন ইংরেজি নাট্যরসের প্রতি অনুরাগের কথা জানালেও *শর্মিষ্ঠা* নাটকে সংস্কৃত নাট্যরীতিতে নিমজ্জিত ছিলেন।

শর্মিষ্ঠার কাহিনি মন্থর। নাট্যকাহিনিতে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ এবং ঘটনাগত উত্তালতা নেই। ঘটনা পূর্বে ঘটে গেছে। নাট্যকার দর্শককে তার নিস্তরঙ্গ বর্ণনা দিচ্ছেন। 'সংস্কৃত নাট্য সাহিত্য থেকে কবি এই মন্থরতা, তরঙ্গহীনতা,সংঘর্ষ ও ঘটনাকে পাশ কাটিয়ে যাবার মনোভাবটি গ্রহণ করেছেন।'[৬]

শর্মিষ্ঠা নাটকের বিদূষক চরিত্রটি একান্তভাবে সংস্কৃত নাটকের অনুরূপ। কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের বিদূষকের নামানুসারে এই নাটকেও নাম রেখেছেন 'মাধব্য'। সংলাপও সংস্কৃত নাটকের অনুকরণে রচিত। উচ্ছ্বাসপূর্ণ কাব্যময় ভাষা, উপমার অতিরিক্ত ব্যবহার, দীর্ঘ বাক্য, স্বগতোক্তির বাহুল্য সংস্কৃত সংলাপের বৈশিষ্ট্য।

মধুসূদন শেক্সপিয়ারের নাটকের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। গ্রীক নাটকও তার পাঠ ছিল।তবুও প্রথম নাট্যপ্রচেষ্টায় প্রত্যক্ষ কর্ম চাঞ্চল্যের পরিবর্তে বর্ণনার আধিক্য দেখা যায়। তবে বহি:রঙ্গের দিক থেকে সংস্কৃত রীতির কোন কোন জায়গায় বিরোধিতা করেছেন তিনি। সংস্কৃত নাটক কয়েকটি অঙ্কে বিভক্ত থাকে।কোনো দৃশ্য বিভাজন থাকেনা। *শর্মিষ্ঠা* নাটকে পাঁচটি অঙ্ক ও তেরটি গর্ভাঙ্ক রয়েছে যা ইংরেজি নাটকের গঠনরীতি সম্মত।তাছাড়া সংস্কৃত নাটকের নান্দী, নট-নটী, সূত্রধরের উপস্থিতি পরিত্যাগ করেছেন মধুসূদন।

উনিশ শতকের সামাজিক অবস্থা ও সাংস্কৃতিক আবহের ছায়া পড়েছে *শর্মিষ্ঠা* নাটকের চরিত্রসমূহে।প্রধান চরিত্রগুলো মহাভারত থেকে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু নাটকে চরিত্রগুলো মহাভারতের চরিত্রের মত হুবহু বর্ণিত হয়নি।এই পরিবর্তনের কারণ হলো কিছুটা নাটকের প্রয়োজন। একই সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব এবং উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ ও সমকালীন মূল্যবোধের জন্যও এটি প্রয়োজন ছিল। ফলে দেখা যায়, মহাভারতের শর্মিষ্ঠা অনেক প্রগলভ,বাকপটু ও

সাহসী হলেও মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা সহনশীল, কোমল, নির্বিবাদী ও অদৃষ্টে বিশ্বাসী। যযাতির প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়েও তাকে শর্মিষ্ঠা আহবান জানাতে পারেনি। যযাতি শর্মিষ্ঠার মনোভাব বুঝতে পেরে তাকে বিবাহের প্রস্তাব দেন। উনিশ শতকে বাঙালি সমাজে নারীকে যেভাবে দেখানো হতো, শর্মিষ্ঠা চরিত্রে তাই দেখিয়েছেন মধুসূদন। দেবযানির প্রতি কোন ঈর্ষাবোধ তিনি করাননি।যযাতির প্রতিও তার ভালোবাসা তৎকালীন বাঙালি নারীর মত পতিভক্তির রূপ নিয়েছে।

পদ্মাবতী (১৮৬০) নাটক রচনার সময় পর্যন্ত বাঙালির নাট্যরুচি সংস্কৃত নাট্যরসে নিমজ্জিত ছিল। নাটকটি মধুসূদন বেলগাছিয়া নাট্যশালার জন্য রচনা করেন। সমসাময়িক নাট্যকারদের নাটকের ধারা, জনরুচির কথা মাথায় রেখে মধুসূদন তাঁর দ্বিতীয় নাটক *পদ্মাবতী* রচনায় অবতীর্ণ হন। নাটকের কাহিনি নেওয়া হয়েছে গ্রীক পুরাণ থেকে। বাংলা নাট্যসাহিত্যে এটি অভিনব। এর আগে বিদেশি নাটকের অনুবাদ করেছিলেন হরচন্দ্র ঘোষ। তাঁর নাটকের নাম *চারুমুখ চিত্তহারা*। তবে মধুসূদন গ্রীক পুরাণ থেকে কাহিনি গ্রহণ করে মৌলিক নাটক লিখেছেন। কাহিনি পাশ্চাত্য পুরাণ থেকে গ্রহণ করলেও উপস্থাপনের দিক থেকে তিনি সংস্কৃত নাটকের রীতি অনুসরণ করেছেন। পূর্ববর্তী নাটক *শর্মিষ্ঠায়* মধুসূদন ভারতীয় পুরাণ থেকে কাহিনি চয়ন করে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। এই জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির চেষ্টা করা ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু মধুসূদন পরোনো পথে না হেঁটে পাশ্চাত্য পুরাণ থেকে কাহিনি নিয়ে নতুন পথে পা বাড়িয়েছেন। 'নূতন পথ তাঁর নিজের পূর্ব সৃষ্টির দিক থেকে -বাংলা নাট্যসাহিত্যের ঐতিহ্যের দিক থেকে -বাঙালির সামগ্রিক সাহিত্যিক রুচির ব্যাপারেও।'[৭]

নাটকের কাহিনিতে দেখা যায় তিন দেবীর মধ্যে সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতা। রাজা ইন্দ্রনীলকে বিচারক হিসেবে মনোনয়ন। তিন দেবীই শ্রেষ্ঠ সুন্দরীর পুরস্কার পাওয়ার লোভে বিচারককে প্রলুব্ধ করতে চায়। প্রেমের দেবী রতির প্ররোচনায় বিচারক বিহ্বল হয়ে তাকেই শ্রেষ্ঠ সুন্দরী বলে মনোনয়ন করেন। দেবী রতির চেষ্টায় ইন্দ্রনীলের সুন্দরী নারীলাভ।অন্য দুই দেবী শচী ও মুরজার বাধাদান ও ক্ষতিসাধনের চেষ্টা। দেবীদ্বয়ের চেষ্টায় ইন্দ্রনীলের রাজ্যে বহুদেশের রাজন্যবর্গের আক্রমণ।

পদ্মাবতী নাটকের কাহিনি গ্রীক পুরাণ থেকে গ্রহণ করা হলেও নাটকের কাহিনি বিন্যাসে সংস্কৃত নাটকের আদর্শকে অনুসরণ করা হয়েছে। নাটকে মানব চরিত্র তিনটি-ইন্দ্রনীল,পদ্মাবতী এবং বিদূষক। দেব-দেবীর মধ্যে রয়েছে শচী,রতি,মুরজা,নারদ এবং কলি।মানব চরিত্র সৃষ্টিতে সংস্কৃত নাটকের প্রভাব পরিলক্ষিত। অন্যদিকে দেব-দেবী চরিত্র সৃজনে গ্রীক চিন্তার প্রভাব রয়েছে। সংস্কৃত নাটকের পরিচিত চরিত্র 'ভাঁড়' এর অনুকরণে নাটকে সৃষ্টি করা হয়েছে বিদূষক 'মানবক' চরিত্র। দেব চরিত্রগুলো সৃষ্টিতে গ্রীক পুরাণের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। গ্রীক দেব-দেবীর মধ্যে একটা রুক্ষতা,উগ্রতা ও প্রবৃত্তি প্রবণতা দেখা যায়। অপরদিকে ভারতীয় পৌরাণিক দেব-দেবী অধিকাংশ ক্ষেত্রে কল্যাণশক্তির অধিকারী।

পদ্মাবতীর ভাষা পূর্ববর্তী নাটকের তুলনায় সহজ ও কথ্যরীতির নিকটবর্তী। সংস্কৃত ভাষার জড়তা থেকে এ ভাষা অনেকটা মুক্ত। বাক্যগঠন পূর্বের তুলনায় কম শিথিল। ধীর গতি ও গম্ভীর চাল থেকে তুলনামূলকভাবে সাবলীল। দীর্ঘ বাক্যের তুলনায় হ্রস্ব বাক্যের প্রয়োগ রয়েছে। কবিত্বপূর্ণ ভাষা ও স্বগতোক্তির স্বল্পতা পরিলক্ষিত। বিবৃতিমূলকতার তুলনায় ঘটনা-তরঙ্গে কিছুটা আবর্তিত। লঘু ভাব প্রকাশের জন্য কথ্যরীতি ব্যবহার করেছেন। অন্যদিকে গম্ভীর ভাব ও উচ্ছ্বাসের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন সংস্কৃতানুগ ভাষা। সংলাপেও চরিত্রবৈশিষ্ট্য রক্ষা করেছেন নাট্যকার। বিদূষক চরিত্রকে লোভী, ভীরু, সুযোগ সন্ধানী; কলির আচরণে রয়েছে নিষ্ঠুর চক্রান্ত; কুঞ্চীর সংলাপে বৃদ্ধের স্মিতহাস্যের অনুরণন রয়েছে।

মধুসূদন *পদ্মাবতী* নাটকে গ্রীক পুরাণের পাত্র-পাত্রীদের নাম পরিবর্তনই করেননি আচরণেরও পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। গ্রীক পুরাণে প্যারিস কামাতুর একটি চরিত্র। তবে *পদ্মাবতী* নাটকে *ইন্দ্রনীলের* দেহবাসনা আদিম তীব্রতা নিয়ে প্রকাশ পায়নি। গ্রীক জীবনচর্চার ভক্ত হলেও উন্মুক্ত নগ্নতার চিত্রায়ণের পরিবর্তে সমকালীন দর্শকদের রক্ষনশীল মনোভাবকে মাথায় রেখে চরিত্র সৃষ্টি করেছেন মধুসূদন। প্রবৃত্তির তীব্র আলোড়ন এবং তার ভয়াবহতা দেখাননি। কেবল গ্রীক জীবনসত্যের কিছু উপকরণ গ্রহণ করেছেন। গ্রীক পুরাণের গল্পের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করে কাহিনির ভারতীয় রূপ দিয়েছেন। ইন্দ্রনীলের মত পদ্মাবতী চরিত্রেও ভারতীয় সাহিত্যের নায়িকা চরিত্রের কমনীয়তা ও কল্যাণবুদ্ধির প্রকাশ ঘটেছে।

কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১) নাটকের কাহিনি নেওয়া হয়েছে জেমস টডের *রাজস্থান* গ্রন্থের রাতপুত ইতিহাস থেকে। নাটকটি উৎসর্গ করা হয়েছে বিশিষ্ট অভিনেতা কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে। নাটকের কাহিনিতে দেখা যায় -মেবারের রাজা ভীমসিংহ শাসক এবং পিতা হিসেবে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন। মেবারের রাজনৈতিক অবস্থা তখন সংকটাপন্ন। মারাঠাদের আক্রমণে মেবার রাজ্য পর্যুদস্ত। অর্থের বিনিময়ে মেবাররাজ কোনরকমে রাজ্য রক্ষা করছেন। এসময় ভীমসিংহের সুন্দরী ষোড়শী কন্যা কৃষ্ণকুমারীকে বিয়ে করার জন্য তিন হাজার সৈন্য নিয়ে মেবার রাজের কাছে প্রস্তাব পাঠান রাজা জগৎসিংহ। রাজা জয়পুর রাজের প্রস্তাব গ্রহণ করে বিয়েতে সম্মতি দেন। এদিকে মারাবারের রাজা মানসিংহ তার পূর্ববর্তী মৃতরাজার বাগদত্তা হিসেবে কৃষ্ণকুমারীকে দাবী করেন। তিনি জানান তাঁর দাবি প্রত্যাখ্যাত হলে তিনি জয়পুর রাজের সঙ্গে বিয়েতে বাধা দেবেন। ফলে ভীমসিংহ জয়পুর রাজ প্রতিনিধিকে ফিরিয়ে দেন।কৃষ্ণকুমারীকে পাওয়ার জন্য জয়পুর রাজ ও মরুদেশের রাজা মানসিংহ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন। উদয়পুর রাজনৈতিকভাবে তীব্র সংকটে পতিত হয়। এসময় অজ্ঞাতনামা ব্যাক্তির চিঠি কৃষ্ণকুমারীর জীবনকে আরও সংকটাপন্ন করে তোলে। চিঠিতে বলা হয় একমাত্র কৃষ্ণকুমারীর মৃত্যুর বিনিময়ে রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হতে পারে। ভীমসিংহ দেশের কথা চিন্তা করে কৃষ্ণকুমারীর মৃত্যুকেই শ্রেয় মনে

করেন। কৃষ্ণকুমারীকে হত্যা করার দায়িত্ব দেওয়া হয় রাজভ্রাতা বলেন্দ্র সিংহের উপর। কৃষ্ণাকে হত্যা করতে গিয়ে বলেন্দ্রের হাত থেকে তরবারি খসে পড়ে। কৃষ্ণকুমারী তখন পিতার আদেশের কথা জানতে পেরে নিজেই আত্মহননের পথ বেছে নিয়ে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করে যায়। এরকম একটি দুঃখজনক পরিস্থিতি নিয়ে নাটকের কাহিনি বিন্যস্ত হয়েছে।

কৃষ্ণকুমারী নাটকের গঠনে দেখা যায় ইতিহাসের ঘটনার মধ্যে গল্পসূত্র হারিয়ে যায়নি। মদনিকা-ধনদাস-বিলাসবতীর ঘটনা নাটকে যুক্ত করে বিচিত্র মানবিক প্রবৃত্তির প্রকাশ, মদনিকার প্রচেষ্টায় কৃষ্ণকুমারীর মানসিংহের প্রতি ভালোবাসার উদ্ভব ঘটিয়ে নাটকে বিচিত্র তরঙ্গের ঢেউ তুলেছেন। কাল্পনিক এসব চরিত্র ও ঘটনার কারণে নাটকে কাহিনি বৃত্ত তৈরি হয়েছে।

নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই নাট্যকার নাট্যসমস্যার অবতারণা করেছেন। প্রথম দৃশ্যেই ঈর্ষা, লালসা ও অর্থ লোভের প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হয়েছে। দ্বিতীয় অঙ্কে নাট্যদ্বন্দ্ব তীব্র না হলেও দূর থেকে তার দামামাধ্বনি শোনা যায়। 'নাটকের তীব্র দ্বন্দ্ব ঘনিয়ে তোলার সব উপকরণ সন্নিবিষ্ট করেছেন এই অঙ্কে।'[৮] তৃতীয় অঙ্কে দ্বন্দ্ব তীব্র আকার ধারণ করেছে। ঘটনার দ্রুততাল লক্ষ্য করা যায় এই অঙ্কে। চতুর্থ অঙ্কের ঘটনাগুলো কাহিনির দিক থেকে প্রয়োজন না থাকলেও বিলাসবতী-মদনিকা-ধনদাস চরিত্র সম্পর্কে কৌতূহল নিবারণ করেছেন নাট্যকার। 'ক্লাসিক আদর্শে এরা পরিহার্য হলেও রোমান্টিক নাটকে কাহিনির শাখা বিস্তারের এ জাতীয় চেষ্টা সর্বদা নিন্দিত হয় না।'[৯] পঞ্চম অঙ্কে ঘটনার আলোড়ন তীব্র। কৃষ্ণকুমারীকে হত্যা করে বিপদমুক্তির আদেশ আসে। ঘটনার আকস্মিকতায়, বেদনার তীব্রতায় নাট্যরস এই অঙ্কে চরম আকার ধারণ করে।

কাজে দেখা যাচ্ছে *কৃষ্ণকুমারী* নাটকের গতি মন্থর নয়। এখানে বর্ণনার আধিক্য নেই। নেই দীর্ঘ বক্তৃতা বা অকারণ কবিত্ব। এর পটভূমিতে রয়েছে রাজ্যের ভাঙাগড়া, চাতুর্য, অর্থলিপ্সা, কামনা-বাসনা, বাৎসল্য, অর্ধস্ফুট প্রেম এবং দুর্বল নৃপতির বেদনা। ফলে নাটকীয় ঘটনা বিচিত্র প্রবৃত্তির তরঙ্গে আলোড়িত। অর্থাৎ নাটক কর্মমুখর। সংস্কৃত নাটকের মন্থর গতি পরিহার করে এক্ষেত্রে নাট্যকার পাশ্চাত্য রীতি অনুসরণ করেছেন।

কৃষ্ণকুমারী নাটকটি মধুসূদন রচনা করেছিলেন তৎকালীন বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রেরণায় রাজপুত ইতিহাস অবলম্বনে। এর পেছনে ছিল তৎকালীন দেশ-কালের দাবি। ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের পরে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে পরাধীন ভারতবাসীর মনে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল। ফলে পরাধীন জাতি তাদের আত্মমর্যাদা খুঁজে পেতে চেয়েছিল অতীত ঐতিহ্যের মধ্যে। নাটকে দেখা যায় স্বদেশপ্রাণতা,অতীত গৌরব ও বর্তমানের শক্তিহীনতা নিয়ে কষ্ট। স্বজাত্যবোধ ও দেশপ্রেম বড় হয়েছে এখানে সন্তান হত্যার কষ্টের চেয়েও।

কালিদাসের *মালবিকাগ্নিমিত্র* ও *বিক্রমোর্বশী* এবং শ্রীহর্ষের *রত্নাবলী* ও *প্রিয়দর্শিনী* নাটকের কাহিনিভঙ্গির সঙ্গে মিল রয়েছে *শর্মিষ্ঠা* নাটকের। একই জাতীয় কাহিনি অনুসরণ করা হয়েছে এই নাটকগুলোতে যেখানে বিষয় হলো বিবাহিত নৃপতির অপর নারীর প্রতি প্রেম এবং ত্রিভুজ প্রণয়সমস্যা। তাছাড়া কালিদাসের *শকুন্তলা* নাটকের বহু বাক্য ও পরিস্থিতি *শর্মিষ্ঠায়* অনুসৃত হয়েছে। সংস্কৃত নাটকের মধ্যে কালিদাসের প্রতি মধুসূদনের শ্রদ্ধা ছিল। তাছাড়া সমকালীন বাংলা নাটকের প্রধান আদর্শই ছিল সংস্কৃত নাটক। তবে মধুসূদনের মনোগত বাসনা ছিল ইংরেজি নাট্যসাহিত্যের রসাবেশ পাঠকচিত্তে সঞ্চারিত করা। কিন্তু নতুন পথের প্রয়োজন উপলব্ধি করলেও সে পথে পা বাড়াতে পারেননি। *শর্মিষ্ঠায়* তিনি সংস্কৃত প্রভাবের মধ্যেই আবর্তিত হয়েছেন।

পদ্মাবতী নাটকে মধুসূদন গ্রীক পুরাণের কাহিনি নিয়েছেন। মধুসূদন পাশ্চাত্যরীতিকে বিস্ময়কর সমগ্রতায় আত্মস্থ করে *ওভীদের* আদর্শে *বীরাঙ্গনা কাব্য* রচনা করেন। গ্রীক জীবনবোধের অনুসরণে রচনা করেন *মেঘনাদবধ কাব্য*। তবে সমকালীন সংস্কৃতানুগ জনরুচির কারণে পাশ্চাত্য নাট্যরীতি অনুসরণ সম্ভব হচ্ছিলনা বলে *পদ্মাবতী* নাটকে পাশ্চাত্য কাহিনির সাহায্যে তৃপ্তি পাওয়ার চেষ্টা করেছেন। তবে গ্রীক সাহিত্য ও ভাবলোকের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের প্রথম সংযোগ স্থাপিত হয় *পদ্মাবতী* নাটকে।

'*কৃষ্ণকুমারী* নাটকে পাশ্চাত্য নাট্যরীতির নিঃসন্দিগ্ধ জয় ঘোষিত হয়েছে।'[১০] নাটকের কয়েকটি বিশেষ বিশেষ স্থানে ইংরেজি নাটকের ছায়াপাত ঘটেছে। রাজা ভীমসিংহের হাহাকারের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে শেক্সপিয়ারের 'কীং লিয়রের' বেদনার্ত চিৎকারের। শেক্সপিয়ারের *কীং জন* নাটকের ফিলিপ চরিত্রের সঙ্গে কৃষ্ণকুমারী নাটকের বলেন্দ্রের মিল রয়েছে। এই মিল শুধু পরিচয়গত নয়, চরিত্রগতও। দুটি চরিত্রেই রয়েছে তীক্ষ্ণ রাজনীতি, সাহস ও সহৃদয় মানবতা। নাটকে কৃষ্ণকুমারীর পদ্মিনী মূর্তি দর্শনের পরিকল্পনাটি মধুসূদন *হ্যামলেট* নাটকের পিতার প্রেতদর্শন এবং *ম্যাকবেথ* নাটকের ব্যাঙ্কোর প্রেতাত্মার সাক্ষাৎকার থেকে গ্রহণ করেছেন বলে ধরে নেয়া যায়। নাটকের কাহিনি অংশের সঙ্গে মিল রয়েছে গ্রীক নাট্যকার ইউরিপিদিসের *ইফিগিনিয়া ইন অলিস* নাটকের।

কৃষ্ণকুমারী নাটকে পাশ্চাত্য নাটকের প্রভাব থাকলেও সংস্কৃত নাটকের সব চিহ্ন একেবারে মুছে ফেলতে পারেননি। কৃষ্ণকুমারী চরিত্রে কালিদাসের শকুন্তলা চরিত্রের সহজ কোমলতা, প্রণয়িনী নায়িকা চরিত্রের ইঙ্গিত রয়েছে। এছাড়া শুদ্রকের *মৃচ্ছকটিক* নাটকের রূপোপজীবিনী বসন্তসেনার আদলে আঁকা হয়েছে *বিলাসবতী* চরিত্র। দুজনে পণ্যানারী হয়েও গভীর ভালোবাসা পোষণ করে প্রণয়ীর প্রতি। তাদের ভালোবাসা শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়-ভোগে সীমাবদ্ধ থাকেনি।

উপরে আলোচিত মধুসূদনের তিনটি নাটকের পরিচিতি, আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য, জীবন ও পরিপার্শ্বের সঙ্গে সম্পর্ক, বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করে শিক্ষাবিজ্ঞানের নিয়মগুলো যুক্ত করা যায়। সেক্ষেত্রে নাটকের পরিচিতি অংশে মহাভারত, গ্রীক পুরাণ,ইতিহাস থেকে উপাদান নিয়ে রচিত অন্যান্য নাটকের পরিচয় দেওয়া যেতে পারে *শর্মিষ্ঠা*,*পদ্মাবতী* ও *কৃষ্ণকুমারী* নাটকের সঙ্গে। নাটকের আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে সংস্কৃত নাটক, গ্রীক পুরাণ উপাদান নিয়ে রচিত নাটক, ঐতিহাসিক নাটকে ভিডিওচিত্র, স্থিরচিত্র দেখানো যেতে পারে এবং এজাতীয় শ্রুতি নাটকও শোনানো যেতে পারে। সরাসরি এই নাটকগুলো মঞ্চে অভিনয় দেখা যেতে পারে। তাছাড়া নিজেরাও অভিনয়ের আয়োজন করতে পারে। তুলানামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে অন্য নাটকগুলোর পাঠ গ্রহণের পরামর্শ প্রদান, নাটকের ভিডিও চিত্র কিংবা প্রর্দশনী দেখা যেতে পারে। শিখন কৌশল হিসেবে মধুসূদনের নাটক, বাংলা নাটক, নাট্যসাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে কুইজ, বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে সক্রিয় শিক্ষাকে উৎসাহিত করা যায়।

শিক্ষা বিজ্ঞানের শিখন ও শেখানোর কৌশলগুলোর মধ্যে দিয়ে মধুসূদনের নাটক সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান, ধারণাগত স্পষ্টতা অর্জন, তুলনামূলক আলোচনা ও সমালোচনামূলক চিন্তা-ভাবনা করার ক্ষমতা, বিশ্লেষণ ক্ষমতা অর্জন হবে। জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও বিশ্লেষণের মতো চারটি ধাপের দক্ষতাও অর্জন হবে। এই সুবিন্যস্ত পদ্ধতিতে শিখন ও শেখানোর কৌশল পরিচালিত হলে শিক্ষার্থীদের শেখার আগ্রহ তৈরি হবে এবং সক্ষমতার উন্নয়ন হবে।

বাংলা সাহিত্যের পাঠদান ও শিখনকে উপভোগ্য ও কার্যকরকরণের জন্য প্রয়োজন শিখন ও শেখানোর কৌশলের গতিশীলতা ও গুনগত পরিবর্তন। প্রায়োগিক গুরুত্বের বিষয়টি উপলব্ধি করে পাঠক্রম প্রণয়ন করেও সাহিত্য অধ্যয়ন যুগোপযোগী করা যায়। কারিকুলাম ডিজাইনে পরিবর্তনের পাশাপাশি বর্তমান আধুনিক পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য অবকাঠামো উন্নয়ন যেমন-সাউন্ড সিস্টেম, কম্পিউটার ও মাল্টিমিডিয়া, স্মার্ট বোর্ড, ইন্টারনেট সংযোগ, ল্যাব, প্রশিক্ষণ কক্ষসহ সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থাও জরুরি। মধুসূদনের নাটকের পাঠদানকালে বিষয়গুলো গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা যায়।

মধুসূদন স্বল্পপরিসর সৃষ্টিকালেও নিজেকে বৈচিত্র্য আর বৈভবে উজার করে দিয়েছিলেন। জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে শিখন ও শেখানোর কৌশলের মধ্যে দিয়ে আমরা মধুসূদনের সাহিত্যকর্ম তথা তার নাট্যকর্মের সম্যক পরিচয় লাভ করতে পারি।

তথ্যসূত্র

১ মালেক, আবদুল; বেগম, মরিয়ম; ইসলাম, ফখরুল; রিয়াদ, শেখ শাহবাজ। *শিক্ষাবিজ্ঞান ও বাংলাদেশের শিক্ষা*। ঢাকা: ২০০৭, পৃ. ৬০।

২ ভট্টাচার্য্য, আশুতোষ। *বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস।* কলকাতা: ১৯৭৫, পৃ.১৪৩।

৩ দত্ত, বিধান (সম্পাদিত)। *মধুসূদন স্মৃতি*। কলকাতা: ১৯৮৪, পৃ.৯০।

৪ চক্রবর্তী, শ্রুতিনাথ। *মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী ও প্রতীচ্য ভাবনা*। কলকাতা: ২০১৬, পৃ. ভূমিকাংশ,।

৫ ক্ষেত্রগুপ্ত, ডক্টর। *নাট্যকার মধুসূদন।* কলকাতা: ১৩৬৯, পৃ.৮৮।

৬ *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৪।

৭ *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৯।

৮ *প্রাগুক্ত*, পৃ.২২০।

৯ *প্রাগুক্ত*, পৃ.২২১।

১০ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৩।